মহাজীবনের কয়েক পাতা

॥ উচিত শিক্ষা ॥

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমরা ছিলাম পরাধীন, ইংরেজের কঠিন শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। ইংরেজরা তখন কারণে অকারণে ভারতীয়দের অপমান করে আনন্দ পেতেন। তাঁরা ভারতীয়দের বলতেন 'নেটিভ', আর তাদের প্রতি কোনও রকম সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভারতীয়দের ভেতরে অনেকেই অপমান নীরবে সহ্য করতো, কোনও প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। কিন্তু আমি যাঁর কথা বলবো তিনি তা মোটেই সহ্য করতেন না।



সাহেবরা রাজার জাত বলে অযথা ভয় পাবার মত লোক তিনি ছিলেন না। যাঁরা অকারণে ভারতীয়দের অপমান করতেন তাঁদের তিনি গ্রাহ্যই করতেন না।

এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলি শোন,—

একদিন কোনও একটা কাজে ভদ্রলোক গিয়েছেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 'কার সাহেবে'র সংগে দেখা করতে। কার সাহেব তাঁকে ঢুকতে দেখে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাঁর জুতোসুদ্ধ

বিহার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত পঞ্চম শ্রেণীর
সিলেবাস অনুসারে লিখিত।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত নতুন সিলেবাস
অনুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য

মহাজীবনের কয়েক পাতা

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দ্রুত পঠনের বই)

প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

নতুন ছড়া ও কবিতা, খোকা বাবুর ছড়া, রেখা ও লেখা
ছোটদের নীতি গল্প ও ছড়া, স্মৃতির লেখা, নানান
দেশের রূপকথা, নানান দেশের উপকথা ও গল্প হলেও
মিথ্যে নয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

জ্ঞানতীর্থ
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রাম—কলাগাছিয়া, পোঃ—জলা বিশ্বনাথপুর, হাওড়া হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—টা. ১'০০ মাত্র

৩১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ বাণী মুদ্রিকা হইতে
শ্রীতারাচাঁদ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

॥ ন্যায় বিচার ॥

আদালতে বিচার চলেছে।

আসামী হিসাবে দু'জন লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। সাক্ষীসাবুদও এসেছে অনেক। দু'জনের ভেতরে কে যে প্রকৃত দোষী তা বিচারক স্থির করতে পারছেন না।

বিচারক, দু'জন আসামীকেই তাদের বক্তব্য পেশ করতে বললেন।

একজন বললে, হুজুর, আমি সত্যই কোনও দোষ করিনি। রাতের বেলা রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। তখন দেখতে পেলাম এই লোকটা পাশের বাড়ী থেকে জিনিষ-পত্তর চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। আমি তক্ষুনি একে জড়িয়ে ধরে চোর! চোর! বলে চীৎকার করে উঠলাম, গ্রামের লোক আর চৌকিদার ছুটে এলো।



অন্যজন বললে, হুজুর, আগের লোকটা যা বলেছে তা মিথ্যে, আমাকে অন্যায় ভাবে ধরে আনা হয়েছে। রাত্রিবেলা হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়, বাইরে

বের হয়ে দেখি এই লোকটা পাশের বাড়া থেকে জিনিষ-পত্তর চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। আমি তাই দেখে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চোর! চোর! বলে চেঁচাতে থাকি। আমার চীৎকারে গ্রামের লোক আর চৌকিদার ছুটে এলো।

বিচারক গ্রামবাসী ও চৌকিদারের জবানবন্দী নিলেন।

তারা বললে, হুজুর, রাস্তায় এই দু'জন লোক পরস্পর পরস্পরকে জাপটে ধরে এক সংগে চোর! চোর! বলে চেঁচাচ্ছিলো। এদের ভেতরে কে যে প্রকৃত চোর তা বুঝতে না পেরে আমরা দু'জনকেই ধরে নিয়ে এসেছি। বিচারক মহা মুশকিলে পড়লেন।

বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবার কাজ সুরু করলেন।

সংগে সংগে একজন লোক এসে খবর দিলো।

বললে, রাস্তার উপর একজন বিদেশী লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মনে হয় লোকটা মরে গেছে।

কথা শুনে বিচারক আসামী দু'জনকে বললেন, তোমাদের শাস্তি দেব সামান্য। তোমরা এক কাজ কর ঐ বিদেশী লোকটার লাশ কাঁধে করে আদালতে নিয়ে এসো।

দু'জন সিপাইয়ের সংগে আসামী দু'জন বিচারকের আদেশে রওনা হল। সিপাইরা লাশটি আসামীদের কাঁধে চড়িয়ে দিয়ে নিজেরা দূরে দূরেই রইলো।

লাশ কাঁধে নিয়ে আসামীরা চলতে চলতে নিজেদের ভেতরে

বলাবলি করলো, এখন ঠ্যালা সামলাও! কি দরকার ছিল তোমার চোর ধরবার?

প্রকৃত চোর এই কথা বলছিল।

আসামী দু'জন আদালতে এসে দাঁড়ানো মাত্র লাশটি তড়াক্ করে কাঁধ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললো, হুজুর, এই হচ্ছে প্রকৃত চোর! এই বলছিল, ঠ্যালা সামলাও....!

বিচারক একজন সিপাইকে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে কে প্রকৃত চোর তা স্থির করার জন্য এই ছলনা করেছিলেন। বিচারক জানতেন যে সুযোগ পেয়ে এরা দু'জনে নিজেদের ভেতরে কথাবার্তা বলবেই, আর তা থেকে জানা যাবে এদের ভেতরে কে প্রকৃত দোষী।

বিচারকের এ চেষ্টা ব্যর্থ হোল না।

তিনি ঠিকই ধরে ফেললেন।

এমনি বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে যিনি বিচার করতেন তাঁর নাম কি জানো?—ইনি হলেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় এঁর জন্ম হয়। বিচারক হিসেবে ইনি খ্যাতি বা সম্মান যা পেয়েছেন তার চেয়ে আরও বেশী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন সাহিত্যিক হিসেবে। এঁর লেখা আনন্দ মঠ, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ ও বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাস আজও তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

———

।। রাখি বন্ধন ।।

ইংরেজী উনিশ'শো পাঁচ সালের কথা।

লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। বাঙালীরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তিনি গ্রহণ করলেন এই নীতি।

কার্জনের এই ব্যবহারে বাঙালীর মন ও প্রাণ উঠলো বিষিয়ে। চারিদিক থেকে প্রতিবাদ জানানো হোল। কিন্তু কোনও ফল হোল না। সুরু হোল গণ বিক্ষোভ!



গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে বের হোল মিছিল। শোনা গেল, বন্দেমাতরম্! দিকে দিকে ধ্বনিত হ'তে লাগলো, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

সেদিনটা ছিল তিরিশে আশ্বিন।

ভোর না হতেই কোলকাতার রাস্তায় অসংখ্য নর-নারীর পদধ্বনি শোনা গেল।

দলে দলে লোক চলেছে। চলেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। এদের ভেতরে তরুণ কিশোর-কিশোরীর সংখ্যাই বেশী। সকলেরই খালি পা, সকলেরই মুখে এক কথা, বিদেশী জিনিষ বর্জন কর।

জনতা এগিয়ে চললো গঙ্গার ঘাটের দিকে।

আগে আগে চলেছেন একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। যেমন তাঁকে দেখতে তেমনি তাঁর গায়ের রঙ—কাঁচা হলুদের মত।

দলপতি হিসাবে তিনি চলেছেন সকলের আগে গান গাইতে গাইতে,—

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,—
হে ভগবান!

সেই স্বরে স্বর মিলিয়ে এগিয়ে চললো জনতা। জনতা পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর তীরে এসে দাঁড়ালো।

পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতে স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে তারা পরস্পর পরস্পরের হাতে পরিয়ে দিল মিলন রাখি।

রাখি বন্ধনের ভিতর দিয়ে তারা জানালো তাদের প্রাণের একতা। ধ্বনিত হোল, বন্দেমাতরম্।

জনতা এবার এগিয়ে চললো। এগিয়ে চললো শহর পরিভ্রমণের জন্য। এগিয়ে চললো তারা গান গাইতে গাইতে,—এক হউক, এক হউক,—হে ভগবান!

সেদিন সকলের আগে যিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি কে জানো?—ইনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জনতা সেদিন যে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছিল সেটি এঁরই লেখা। স্বদেশী আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য বিশ্বকবি, এরকম বহু গান রচনা করেছিলেন। বাংলাকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করায় কবিরও প্রাণ কেঁদেছিলো। তাইতো সেদিন তিনি স্থির থাকতে পারেননি, যোগ দিয়েছিলেন জনসাধারণের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসবকে জয়যুক্ত করার জন্য।

॥ লাল জলে লাল মাছ ॥

গামলার জলে লাল মাছ গুলো খেলে বেড়াচ্ছে দেখে ছেলেটির আনন্দ আর ধরে না। এক সঙ্গে অনেক গুলো লাল মাছ জলে সাঁতার কাটছিল! ছুটোছুটি করছিল—গামলার এ পাশ থেকে ও পাশ।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছের খেলা দেখছিল।

হঠাৎ তার এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো। ভাবলো সাদাজলে লাল মাছ ঘুরে না বেড়িয়ে যদি লাল জলে ঘুরে বেড়াতো তাহলে না জানি কত সুন্দর লাগতো দেখতে ?



লাল জলে লাল মাছ কি সুন্দরই না দেখাতো।

ছেলেটি এক দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। দৌড়ে ঘর থেকে খানিকটা লাল রং নিয়ে এসে গামলার জলে গুলে দিল। দেখতে দেখতে সাদাজল রক্তের মত লাল হয়ে উঠলো। লাল জলে লাল মাছ।

ছেলেটি যা চাইছিলো ঠিক তাই। বা! কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে ?

কিন্তু একি ?

একটা একটা করে চার পাঁচটা মাছ মরে ভেসে উঠলো। সর্বনাশ! সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল ছেলেটি। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো? দেখলো কেউ দেখতে পেয়েছে কি না? না কেউ টের পাইনি!

দে ছুট!—ছেলেটি ছুট্টে পালালো সেখান থেকে।

তারপরে কি হলো?

তারপর বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল। মাছের গামলায় রং গুললো কে? কে এমন সর্বনাশ করলো?

ছেলেটি ঘরের ভেতর থেকে হৈ চৈ শুনতে পেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সাড়া দিল না—মটকা মেরে পড়ে রইল বিছানার উপর। মাছের গামলায় লাল রং গুলে যে ছেলেটি পালালো সে কে জান?—ইনি হলেন বাংলার সেরা শিশু সাহিত্যিক শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর। এঁর লেখা শকুন্তলা ও ক্ষীরের পুতুল প্রভৃতি বই গুলো তোমরা যখন পড়বে তখন বুঝতে পারবে গল্প লেখায় এঁর হাত ছিল কত মিষ্টি! শুধু লেখায় নয় আঁকাতেও ইনি ছিলেন সকলের সেরা। চিত্রশিল্পী হিসাবে এঁর নাম আজও আমাদের স্মৃতি পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

॥ ডানপিটে ॥

সে ছিল যেমন দুষ্টু তেমনি খেয়ালী।

সময় সময় সে অদ্ভুত খেয়ালে মেতে উঠতো। কখন ছিপ নিয়ে বসে যেত মাছ ধরতে। ছিপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরের ধারে কাটিয়ে দিত।

আবার কখন তাকে ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। হাতে একটা বাঁশের চোঙা নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তোমরা হয়ত ভাবছ সে কি করত ঝোপে-জঙ্গলে?



সে ফড়িং ধরে বেড়াত। ফড়িং ধরে বাঁশের চোঙায় পুরে রাখতো। চোঙাটা ভর্তি হয়ে গেলে বাড়ী ফিরত।

সে নাকি বাগানও করত।

নানা রকম গাছ উপড়ে নিয়ে এসে পুঁতে দিত তার সখের বাগানটিতে। তারপর চলত জল ঢালার পালা। পাকা মালির মত সে গাছগুলির পরিচর্য্যা করত।

লাট্টু ঘোরান, গুলি খেলা, পরের বাগানে ঢুকে গাছ থেকে ফল চুরি করা আর ঘুড়ি উড়ানোতেও তার সঙ্গে অন্য ছেলেরা পেরে উঠত না। এজন্য ছেলেরা তাকে একটু ভয়ই করত।

সে ছিল দলের পাণ্ডা।

পাড়ার ছেলেরা তাকে দলপতি বলে মেনে নিয়েছিল। তার কথা ছেলেরা মেনে চলতো।

তার অন্তরে ভয় ডর বলে কোনও জিনিষ ছিলনা।

গভীর রাতে সে একা বাজী রেখে চলে যেত শ্মশান ঘাটে। যে বাড়ীকে লোকে ভূতের বাড়ী বলতো সেখানে ঢুকতেও সে ভয় পেতনা।

তার প্রিয় বন্ধুটির নাম ছিল রাজেন।

রাজেন খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতো। রাজেনের কাছ থেকে সে চটপট বাঁশি শিখে নিল।

শুধু কি বাঁশি বাজানো?

সে শিখলো বেহালা, এস্রাজ, তবলা ও হারমনিয়ম বাজাতে। তারপর সুরু হোল গান-বাজনা আর নাটক অভিনয়

ভব ঘুরের মত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেও সে ভালবাসত। একবার নাকি পায়ে হেঁটে ভাগলপুর থেকে রওনা হয়েছিলো পুরীর দিকে। তার এই ভবঘুরে স্বভাবটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই সে বাপের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে অভিমানে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলো বেশ কিছুদিন এদেশ—ওদেশ!

ছেলেটার নাকি লেখারও সখ ছিল।

সময় পেলেই সে মজার গল্প লিখে ফেলতো।

পরবর্তী জীবনে এই লেখাই তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ছোট বেলার লেখার নেশা বড় হলে পেশায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বলতো এই ছেলেটা কে? ইনি হলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। এঁর মতো দরদী কথা শিল্পী আমাদের দেশে আর জন্মেছেন বলে মনে হয় না। যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল ও উৎপীড়িত, —মানুষ যাদের চোখের জলের কোনও হিসেব রাখেনা তাদের কথাই ইনি লিখেছেন অসীম দরদ দিয়ে। সাধারণ মানুষের দুঃখ অভাব ও অভিযোগ ইনি যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে এঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে উপায় নেই।

॥ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ॥

চমকে উঠলেন বেগম সাহেবা।

চমকে উঠলেন নবাবের পিঠে কালো লম্বা দাগটা দেখে।

জিজ্ঞেস করলেন, জনাব, আপনার পিঠে ওটা কিসের দাগ ?

নবাব ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, ও কিছু নয়।

বেগম সাহেবাও ছাড়ার পাত্রী নয়। বললেন, তা কি হয় জনাব। নিশ্চয়ই ওখানে কিছু হয়েছিল ?



নবাব স্তব্ধ হলেন। স্তব্ধ হয়ে বললেন, সব কথায় তোমার দরকার কি ? কবে কি হয়েছে না হয়েছে তা জেনে তোমার কি লাভ ?

সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবাও বললেন, না জনাব আমাকে বলতেই হবে কি হয়েছিল ? নবাব গম্ভীর হয়ে বললেন, বেশ তাহ'লে শোন, তুমি নিশ্চয়ই সুবুদ্ধি রায়ের নাম শুনেছো ?

হ্যাঁ শুনেছি। বর্তমানে সে তো আপনার অধীনস্থ একজন রাজা।

—এখন সে আমার অধীনে রাজা হিসেবে কাজ করছে বটে কিন্তু চিরদিন সে আমার অধীনস্থ ছিল না। অনেক দিন আগে আমিই ওর অধীনে চাকরী করতুম। বেগম সাহেবা শুনে বিস্ময়ে

হতবাক হলেন। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় করে বললেন, তার পর ?

—এক সময়ে সে আমার উপর একটা পুকুর কাটবার ভার দিয়েছিল। পুকুর কাটতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় আমার উপর ওর সন্দেহ হোল—ভাবলো আমি নিশ্চয়ই কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছি। সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে তাঁর প্রাসাদে ডেকে পাঠালো। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে গিয়ে সপাং ! সপাং ! করে কয়েক ঘা চাবুক আমার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললে, ছিঃ ! ছিঃ ! তোমার এই কাজ।

একটু থেমে নবাব বললেন, আমার পিঠে যে কালো দাগ দেখছো তা ঐ চাবুকের দাগ। নবাবের কথা শুনে বেগম সাহেবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, জনাব, আপনি নবাব হওয়ার পরও তাকে জীবিত রেখেছেন ?

বেগম সাহেবার কথায় নবাব উত্তেজিত না হয়ে শান্ত ভাবে বললেন, আজকে আমি নবাব হয়েছি তা ওরই বুদ্ধিবলে আর দয়ায়

বেগম সাহেবা নবাবের কথায় খুশী হতে পারলেন না। বরং আরও রেগে গেলেন। বললেন, তবু ওকে হত্যা করে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল।

—তা হয়না। আমি তার অনেক নিমক খেয়েছি নেমকহারামি করতে পারি না। তবে তুমি যখন বলছো তখন একটা কাজ করা যাক। সুবুদ্ধি রায়কে এখানে ডেকে এনে তার জাত মেরে দেওয়া যাক। হিন্দু সমাজে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।

বেগম সাহেবা দেখলেন প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তাই তিনি বললেন, তবে তাই করুন জনাব। নবাব সুবুদ্ধি রায়কে একদিন তাঁর প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন।

নবাবের আদেশে সুবুদ্ধি রায় নবাবের সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বাড়ী ফিরলো—নবাব তার জাত মেরে তাকে সমাজে একঘরে করে রাখলেন। গৌড়ের লোকেরা সুবুদ্ধি রায়কে একঘরে করলো।

সুবুদ্ধি রায় কত মিনতি করলো কিন্তু পণ্ডিতেরা কিছুতেই রাজী হলেন না। তাঁরা একবাক্যে বললেন, এ পাপে তুষানল করা ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা শাস্ত্রে নেই। পণ্ডিতদের কথায় সুবুদ্ধি রায় চমকে উঠলো।

শেষে বিষয় সম্পত্তি, ঘর সংসার ছেড়ে কাশী চলে গেল। ভাবলো কাশীর পণ্ডিতেরা হয়ত অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন।

কিন্তু কোনও ফল হোলনা। কাশীর পণ্ডিতেরাও বললেন তপ্ত ঘৃত পাশে প্রাণ ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

ঠিক এমনি সময় একজন পণ্ডিত এলেন কাশীতে।

সকলেরই মুখে তাঁর কথা। তাঁকে দর্শন করার জন্য দলে দলে লোক ছুটে আসে তাঁর কাছে। তাঁর মধুর কীর্তনে সকলেই নেচে ওঠে।

কাশীর অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর চরণে ঠাঁই পেয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম কোটি কোটি লোক গ্রহণ করে—করেছে পরম তৃপ্তি লাভ।

খবর পেয়ে সুবুদ্ধি রায় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

পণ্ডিতের শ্রীচরণ স্পর্শ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, প্রভু, দয়া করুন। ক্ষমা করুন আমার অপরাধ। উদ্ধার করুন আমাকে, আমি পতিত, সমাজে আমার স্থান নেই। জোর করে আমার জাত মেরে দেওয়া হয়েছে।

—জাত মেরে দেওয়া হয়েছে! সমাজে তোমার স্থান নেই, তুমি পতিত!

সুবুদ্ধি রায়ের কথা শুনে পণ্ডিত কেঁদে ফেললেন।

কাঁদতে কাঁদতে সুবুদ্ধি রায়কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই, কে বলেছে তোমাকে পাপী? তুমি কোনও পাপই করনি। পাপ না করলে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন?

সুবুদ্ধি রায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তবে যে গৌড়ের লোকেরা বলে আমি পাপী। আমার জাত গেছে,—আমি পতিত।

পণ্ডিত মৃদু হেসে বললেন, ভাই, জাত কি কারও মারা যায়। তুমি হরিনাম কর। হরির নামেই তুমি হবে শুদ্ধ—পবিত্র। তোমাকে এ ছাড়া আর কিছুই করতে হবে না। পণ্ডিতের কথায় সুবুদ্ধি রায়ের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল। মুখে দেখা দিল হাসির রেখা। আশার আলো ঝিলিক মারলো তার মনের দোরে, ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস। নতুন আনন্দে সে প্রাণ ভরে করতে লাগলো হরিনাম।

যে পণ্ডিতের শ্রীচরণ স্পর্শে আর সহানুভূতিতে সুবুদ্ধি রায় শুদ্ধ হোল তাঁর নাম কি জানো?—ইনি হলেন নদের নিমাই। এঁর

জন্ম হয়েছিল নদীয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মায়ের নাম শচীদেবী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্য। ইনি এক নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন—তার নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের নাম তাই আজও আমাদের স্মৃতি পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

———

॥ সৈনিক থেকে সন্ন্যাসী ॥

বাঁশীর শব্দ শুনলেই নিমাই আনমনা হয়ে পড়তেন।

দূর থেকে বাঁশীর সুর কানে ভেসে এলেই বলতেন, ঐ যে আমার কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন! ঐ যে, ঐ যে তিনি আমায় ডাকছেন!

গাছের তলে বসে ছিলেন নিমাই আর তাঁর চারজন ভক্ত।

ভক্তদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো রাখালিয়া বাঁশীর সুর।

শাস্ত্র আলোচনা ছেড়ে নিমাই আনমনা হয়ে পড়লেন। কান পেতে শুনতে লাগলেন—বাঁশীর সুর।

ভক্তদের বললেন, শুনছো, ঐ যে আমায় ডাকছে। ওরে, ও যে থেকে থেকেই আমাকে ডাকে।

ভক্তরা বললেন, প্রভু, এতো রাখালিয়া বাঁশীর সুর।

নিমাই বাধা দিয়ে বললেন, না-না, এ বাঁশী কৃষ্ণের বাঁশী বাঁশীর সুরে জানাচ্ছে তুমি এসো, কাছে এসো।

বলতে বলতে নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ভক্তেরা মহা বিপদে পড়লো।

প্রভুকে আগলে বসে রইলো। কারণ, জ্ঞান না ফিরলে তো আর বাসায় নিয়ে যাওয়া যায় না।

একদল অশ্বারোহী পাঠানসৈনিক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা ঐ দৃশ্য দেখে চটপট ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ভাবলো

এরা বোধ হয় দস্যু। লোকটাকে কিছু খাইয়ে বেহুঁস করে টাকা-কড়ি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

তাই তারা ভক্তদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।



সৈনিকদের ভেতর থেকে একজন বল্‌লে, তোরা এক সাধুকে খুন কর্‌লি কেন বল? নইলে এখখুনি কেটে ফেলবো।

ভক্তেরা সৈনিকদের দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকলো।

ভক্তদের ভেতরে একজন ছিল বয়সে বুড়ো। সে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে, মনে সাহস এনে বললো, আমরা এঁকে মারিনি হুজুর। ইঁনি আমাদের প্রভু। আমরা এঁর শিষ্য। মাঝে মাঝে ইঁনি এমনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন—আবার ভাল হয়ে যান। বিশ্বাস না হয় একটু অপেক্ষা করুন।

কথাটা বিশ্বাস হোল না সৈনিকদের।

তাই তারা বললো, মিথ্যে বলে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করিস্‌না। সত্যি করে বল্‌, নইলে এখখুনি কেটে ফেলবো।

একজন সৈনিক খাপ্‌ থেকে চকচকে তলোয়ার বের করতেই ভক্তেরা ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

ঠিক এমনি সময় নিমায়ের জ্ঞান ফিরে এলো।

নিমাই উঠে বসলেন। ও কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলে নাচতে সুরু করলেন।

পাঠান সৈনিকেরা বিস্মিত হয়ে নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একজন জিজ্ঞেস করলো, সন্ন্যাসী ঠাকুর, এরা কি তোমার টাকা পয়সা চুরি করার জন্য তোমাকে কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে রেখে ছিলো ?

নিমাই বললেন, না, এরা আমার ভক্ত। এরাই আমার দেখাশেনা করে। সৈনিকদের সন্দেহ মিটলো।

সৈনিকদের ভেতরে একজন ছিল একটু পণ্ডিত গোছের। জ্ঞানী বলে তার একটু অহঙ্কারও ছিল। সে নিমাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বর আর ধর্ম নিয়ে তর্ক সুরু করলো।

নিমাই আস্তে আস্তে তার সমস্ত যুক্তিই নস্যাৎ করে দিলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যে সৈনিক মুগ্ধ হোল।

মুগ্ধ হয়ে বললো, প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি অযথা আপনার সংগে তর্ক করেছি। আমায় দয়া করুন। আমি আপনার ভক্ত হতে চাই।

সৈনিকের কথা শুনে নিমাই খুশী হলেন।

খুশী হয়ে বললেন, বেশ তুমি আজ থেকে হরিনাম করো। সৈনিক কৃষ্ণ নাম করতে লাগলো।

সৈনিক শেষে সৈনিকের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে নিমাইয়ের শিষ্য হোল। নিমাই এর নাম রাখলেন—রামদাস।

তাইতো রামদাসকে সকলে 'পাঠান বৈরাগী' বলতো।

॥ হিসাবের খাতায় গান ॥

বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলেটা মহা বিপদে পড়লো।

এতদিন যা হোক কোন রকমে চলে যাচ্ছিল,—সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতে হোত না। কিন্তু এখনতো আর তা হবার উপায় নেই। মস্তবড় সংসারের দায়িত্ব চাপলো ঘাড়ে।

ছেলেটি কিছু লেখা পড়া শিখেছিল। শুধু বাংলা নয়, সংস্কৃত, হিন্দী ও ফার্সী ভাষাও সে জানতো।

বের হল চাকরীর সন্ধানে।



ঘুরতে ঘুরতে হালিশহর থেকে কলকাতায় এলো।

তখন কলকাতায় অনেক বড় বড় জমিদার বাস করতেন। হঠাৎ এক জমিদার বাড়ীতে তার কাজ হয়ে গেল। মুহুরীর কাজ—বসে বসে শুধু যোগ আর বিয়োগ করা।

চাকরী পাবার পর মনে একটু জোর এলো।

আনন্দে কাজ করতে লাগলো —জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়। লোকে বলে 'স্বভাব যায়না মলে।' তাই গান লেখা আর গান গাওয়ার শখ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। অবসর সময়ে জমিদারী খাতায় লিখতে সুরু করলো আবল তাবল কত কি।

নায়েব মশায় খাতা খুলে চোখ কপালে তুলে ঈশ্বরের নাম

স্মরণ করলেন। দেখলেন খাতার কোণে লেখা রয়েছে—"মা আমি বিনা মাইনের চাকর ; কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।"

নায়েব মশায় চমকে উঠলেন।

মনে মনে বললেন, এত বড় স্পর্দ্ধা। ধন ভাণ্ডারীর পদ চায় ? নায়েবের সহ্য হোলনা।

সঙ্গে সঙ্গে খাতা হাতে রওনা হলেন জমিদার বাবুর কাছে সগর্বে খাতা খানা সামনে খুলে ধরে বললেন, দেখুন আপনার মুহুরীর কাজ ! কি সব লিখেছে দেখুন।

—'আমায় দেমা তবিলদারী....'

লাইন কটা পড়ে জমিদার মুগ্ধ হলেন। বুঝতে পারলেন মুহুরী একজন বড় কালী সাধক।

জমিদার বাবু মুহুরীকে ডেকে পাঠালেন।

মুহুরী ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই জমিদার বললেন তোমাকে কাল থেকে আর সেরেস্তার খাতা লিখতে হবেনা।

ছেলেটার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

শান্ত ভাবে বললো, তবে কি করে সংসার চালাবো ?

মৃদু হেসে জমিদার বললেন, কালথেকে তুমি শুধু গানই লিখবে। ইচ্ছে করলে তুমি এখানেও থাকতে পার—ইচ্ছে করলে দেশেও চলে যেতে পার। মাসে মাসে তুমি তোমার মাইনে তিরিশ টাকা ঠিকই পাবে। আনন্দে কেঁদে ফেললো ছেলেটি।

জমিদারকে প্রণাম করে রওনা হোল দেশে।

এখন আর কোনও চিন্তা নেই—নেই ভাবনা। মা মুখ তুলে চেয়েছেন—এখন শুধু সাধনা—গান লেখা আর গান গাওয়া।

এই ছেলেটী কে জানো ?

—ইনিই হলেন সাধক রামপ্রসাদ !

।। কথার দাম ।।

ঠাকুর অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

কিন্তু কেন?

নিশ্চয়ই কোথাও একটু ভুল হয়ে গেছে। যা করবেন বলেছেন হয়তো তা করা হয়নি।

ঠিক তাই।

স্পষ্ট মনে পড়লো। মনে পড়লো শম্ভু মল্লিকের কথা।

ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে কথা দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে একটা ওষুধ নিয়ে এসে খাবেন। সেই ওষুধ তো এখনো আনতে যাননি তিনি।



কথাটা মনে হওয়ায় মনটা একটু হাল্‌কা হোল।

তক্ষুনি রওনা হলেন শম্ভু মল্লিকের বাড়ী।

ডাক্তার শম্ভু মল্লিক তখন বাড়ী ছিল না। ডাক্তার খানায় বসেছিল কম্পাউণ্ডার। ঠাকুর কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে রওনা হলেন দক্ষিণেশ্বর।

কিন্তু একি!

আসতে আসতে এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন ঠাকুর।

লক্ষ্য করলেন তিনি যেন চলতে পারছেন না, চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না—পা টলছে।

সামনে এগুতে পারছেন না কিন্তু পেছন দিকে তাকালে রাস্তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

কষ্ট করে বার বার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না, দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ভাবলেন আবার নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে।

ঠিক তাই।

মনে পড়লো ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন তার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তা তো তিনি আনেননি। এনেছেন তার কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে।

ঠাকুর ফিরে গেলেন।

এবার আর পা কোনও বিপদ ঘটালো না—সোজা পা চালিয়ে চললেন।

শম্ভু মল্লিকের বাড়ী ঢুকে ফিরিয়ে দিলেন ওষুধটা কম্পাউণ্ডারের হাতে। ওষুধটা ফিরিয়ে দিতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল।

এবার নিশ্চিন্তে পা চালালেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে—এবার আর পথে কোনও বিপদ ঘটলো না।

এমনি অসাধারণ এঁর সত্যনিষ্ঠা ছিল।

জানো এ লোকটি কে ?—ইনি হলেন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

॥ আশীর্বাদ ॥

কষ্টের সংসার।

কোন রকমে দিন চলে। কোন দিন জোটে কোনদিন জোটে না।

তার উপর গুরুনাথ বেকার।

কাজ নেই, বাড়ীতে বসে আছে। বসে বসে খাওয়া আর ভালো লাগে না। মা-বাবা অযথা গালাগালি করেন।

সময় সময় গুরুনাথের মনটা বড্ড খারাপ লাগে।

বাড়ী থেকে বের হয়ে সোজা চলে যান বন-দুর্গার চালা ঘরে।

বাড়ীর কাছেই বন-দুর্গার চালা ঘর। জায়গাটা মন্দ লাগে না।



চারদিকে বড় বড় বট আর অশ্বত্থ গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ছায়ায় জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

গুরুনাথ এখানেই এসে বসে, চালাঘরে ঢুকে মা-মা বলে ডাকে।

বলে, "মা সংসারে শান্তি এনে দিও!"

মা-মা বলে ডাকলে মনটা একটু হাল্‌কা হয়। কিন্তু তা কতক্ষণ, সেদিনত গুরুনাথ চালাঘরে বসে মা-মা বলে ডাকছিলো, কাঁদছিলো। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল গাল জোড়া।

কাঁদতে কাঁদতে কি রকম যেন একটা ভাব এসে গেল গুরুনাথের। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক সন্ন্যাসিনীর মুখ। সে

দেখতে পেলো এক সন্ন্যাসিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরণে গেরুয়া রঙের লাল পেড়ে শাড়ী আর বাঁ হাতে ত্রিশূল।

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে গুরুনাথের কাছে এগিয়ে এলো।

কাছে এসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, "কাঁদছিস্ কেন বাছা, কাঁদিস্না, চোখ মোছ। তুই চাকরী পাবি।"

—চাকরী পাব ?

চমক ভাঙলো গুরুনাথের। বিস্ময়ে চোখ খুলে দেখলো—কিন্তু একি ! কেউতো নেই তার সামনে দাঁড়িয়ে !

চারদিকে শুধু অন্ধকার।

বড় বড় গাছ গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর সে বসে আছে চালা ঘরে।

সত্যি সত্যিই গুরুনাথ চাকরী পেলো।

চাকরি পেলো সামনের আশ্বিন মাসেই।

কলকাতায় এসে সে শুনলো মায়ের কথা।

শুনে ইচ্ছে হোল মায়ের সঙ্গে দেখা করার।

বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একদিন রওনা হোল মায়ের কাছে।

মাকে দেখে গুরুনাথ বিস্মিত হল।

বিস্মিত হল এই জন্য যে সেদিন দুর্গার বাড়ীতে যে সন্ন্যাসিনীকে সে দেখে ছিলো এ যে অবিকল সেই মূর্তি ! গলার স্বরও এক ! গুরুনাথ আর স্থির থাকতে পারলো না।

বিলিয়ে দিলো নিজেকে মায়ের পায়ে ভক্তি আর শ্রদ্ধায়।

মা খুশী হয়ে গুরুনাথকে মন্ত্র দিলেন।

গুরুনাথ যাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিলো তিনি কে বলতো ?

ইনি হলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি, পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী।

———

।। সত্যের জয় ।।

অনাহারে আর অর্দ্ধাহারে জীর্ণ শীর্ণ দেহ। শান্তি নেই মনে। শুধু অভাব আর অভাব। কোনও রকমে দিন চলে। তার উপরে সামনে এসে দাঁড়ালো নতুন বিপদ।

মুষড়ে পড়লেন ভুবনেশ্বরী।

দু' চোখ জলে ভরে গেল। কথা বলতে পারলেন না। মনে মনে ডাকলেন ভগবানকে।

বললেন, হে ভগবান। মুক্ত কর, শান্তি দাও। বিপদের মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যাও।

কথাটা নরেনের কানে গেল।



বিস্মিত হোল নরেন। ভাবলো সবই তো গেছে দেনার দায়ে, আছে শুধু বাড়ী খানা একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই। তারই ওপর পড়েছে নজর। জ্ঞাতিরা মামলা জুড়েছে। মিথ্যে মামলা জুড়ে ছিনিয়ে নিতে চায় বিধবার সম্পত্তি, চায় ফকির করতে।

নরেন একমনে কি যেন ভাবছিলো।

ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে উঠলো অতীতের স্মৃতি। বাবা তখন বেঁচে। বাড়ীটা তখন গম্ গম্ করতো আত্মীয়-

স্বজনে। মুঠো মুঠো পয়সা রোজগার করতেন বাবা। কিন্তু সঞ্চয় করতেন না এক পয়সাও, যা আনতেন খরচ করতেন তার চার গুণ। আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়াতেন, পরাতেন, আবার অন্যান্য সখও মেটাতেন।

কেউ কিছু বললে তিনি বলতেন, ত্যাগেই আনন্দ, ভোগে নয়।

বিশ্বনাথ দত্তের এই যুক্তির কাছে অন্য যুক্তি ধোপে টিকতো না।

তারপর ?

তারপর বাবা মারা গেলেন। সিমলার দত্ত বাড়ী ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল। সুখের পায়রা দুঃখের ছোঁয়া পেয়ে সরে পড়লো। রইলো যারা তার আপন-জন।

যারা সরে পড়লো তাদের ভেতরেই দু'চার জন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বিশ্বনাথ দত্ত দুধ দিয়ে যে সব কালসাপ পুষেছিলেন তারাই সুযোগ বুঝে ছোবল মারতে শুরু করলো।

বাপরে, কি তাদের ফোঁস ফোঁসানি।

তারাই জুড়েছে মামলা। ছিনিয়ে নেবে বাড়ীটা। নাবালক, বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করতে না পারলে তাদের শান্তি হচ্ছে না।

বিস্মিত হলেও মুষড়ে পড়লো না নরেন।

আসন্ন বিপদের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো—শক্ত করলো মনকে। বিপক্ষ দলে বড় বড় উকিল, ব্যারিস্টার দাঁড়িয়েছে। জোর মামলা চলবে।

নরেন শুনলো সে কথা। ভাবলো কে দাঁড়াবে তাদের হ'য়ে ? অর্থ কোথায় ? কি দিয়ে চালাবে সে মামলার খরচ ?

ধারও দেবেনা কেউ। কারণ—জানে ধার দিলে শোধ দিতে পারবে না। তবে? এমনি বিপদের দিনে এগিয়ে এলেন বিশ্বনাথ দত্তের বন্ধু উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বন্ধু পরিবারের আসন্ন বিপদে তার প্রাণ কাঁদলো।

রাজী হলেন বিনা পারিশ্রমিকে নরেনদের হয়ে ওকালতী করতে।

নরেনের মুখে ফুটে উঠলো আনন্দের রেখা।

অনেক আশা নিয়ে সে কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালো। মিথ্যের আশ্রয় নিলো না। যা সত্য তাই সে বলে গেল উদাত্ত কণ্ঠে।

উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন জজকে। জানালেন তীব্র প্রতিবাদ। বললেন, এ মামলা মিথ্যে।

সত্যের হোক জয়।

নরেনের বাকচাতুর্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন জজ।

নিঃসংশয়ে রায় দিলেন নরেনদের পক্ষে। সংগে সংগে এও বললেন, যুবক বয়সে তুমি একজন নামকরা ব্যারিষ্টার হতে পারবে। তোমার বাকচাতুর্যের প্রশংসা না করে পারছিনা।

নরেন কিছুদিন আইন পড়েছিলো। তাই সে সেদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলো গুছিয়ে তার কথা। তাই সে পেরেছিলো মুগ্ধ করতে জজকে তার বাকচাতুর্যে।

সত্যি সত্যিই মিথ্যে হয়নি জজের কথা।

পরবর্তী জীবনে তাইতো নরেন পেরেছিলো-ধর্ম-মহা-সম্মেলনে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বেদান্তের বাণী প্রচার করতে।

চিকাগো ধর্ম-মহাসভায়, সে মুগ্ধ করেছিলো বেদান্তের বাণী শুনিয়ে সাত হাজার জাগ্রত জনতাকে।

বলতে পারো এই নরেন্দ্র নাথ কে ?

ইঁনিই হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁর আসল নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর এঁর নাম রাখা হয় স্বামী বিবেকানন্দ।

॥ অনুগতা শিষ্যা ॥

—ঐশ্বর্য আমি চাইনা, ভোগে আমার লোভ নেই।

প্রশ্ন করলেন স্বামীজী, তবে তুমি কি চাও ?

কুমারী উত্তর দিলেন, আমি চাই সেবা করতে, নিজেকে দশের কল্যাণে বিলিয়ে দিতে। শুনে খুশী হলেন স্বামীজী।

খুশী হয়ে বললেন বেশ তাই হবে। তুমি আমার সংগে ভারতে চলো।



১৮৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

কুমারী ভারতে চলে এলেন। সব ভাই; বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ এমন কি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে কুমারী নতুন দেশে নতুন পরিবেশে এসে দাঁড়ালেন।

প্রথমে এসে উঠলেন বেলুড়ে।

তখনো বেলুড়ে মঠ তৈরী হয়নি। মঠের জন্য সবে মাত্র জমি কেনা হয়েছে।

কুমারীর জন্য গঙ্গার তীরে একটি কুটির তৈরী করানো হোল।

স্বামীজী কুমারীর শিক্ষার ভার নিলেন।

শেখালেন ভারতের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি। জানালেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস—শোনালেন ভারতের দুঃখ আর

দুর্দশার কথা। আলোচনা করলেন কুমারীর সঙ্গে পরাধীন ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে।

ধীরে ধীরে কুমারী ভারতীয় হয়ে উঠলেন।

তাঁর চাল-চলন, বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ গেল বদলে।

কুমারী স্বামীজীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন—হলেন স্বামীজীর শিষ্যা।

ভারতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য কুমারী এগিয়ে এসে গ্রহণ করলেন কঠোর ব্রত।

ভারতীয় আদর্শে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতার বোস পাড়া লেনে একটা ছোট্ট বাড়ী ভাড়া করা হল—স্থাপিত হল বালিকা বিদ্যালয়।

প্রথম প্রথম বেশী ছাত্রী না জুটলেও কুমারী হাল ছেড়ে দিলেন না। জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের বুঝিয়ে আস্তে আস্তে ছাত্রী সংগ্রহ করতে লাগলেন। এখন বিদ্যালয়টি ছাত্রীতে ভরে উঠল। এল ছোট ছোট মেয়ে, এল কুমারী, এল সধবা মহিলা। আস্তে আস্তে বহু বয়স্ক বধূ ও গৃহিণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীর খাতায় নাম লেখাল।

কুমারী নিজের হাতে শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। চলল শিক্ষা দেওয়ার পালা—সাহিত্য, অংক, নানারকম শিল্প কাজ, সেলাই ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা।

শুধু পড়ান নয়—পড়ান ছাড়া লেখাপড়ার কাজে কুমারীকে ব্যস্ত থাকতে হত।

অবসর সময়ে কুমারী বই লিখতেন। বই লিখতেন স্বামীজী ও ভারত সম্বন্ধে। বই বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যেতো তা বিদ্যালয়ের কাজে ব্যয় করা হতো। এমনি পরিশ্রম করতে করতে অল্প বয়সেই কুমারীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। ফলে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে কুমারী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

বিদেশিনী হয়েও যিনি আমাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে আমাদের এতো ভালবেসেছিলেন তাঁর নাম মিস্ মার্গারেট নোবেল। বাবার নাম স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবেল। বাবা ছিলেন খৃষ্টানপাদ্রী, জাতিতে স্কচ্ আর মা ছিলেন আইরিশ।

স্বামীজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর এঁর নতুন করে নাম রাখা হয় ভগিনী নিবেদিতা।

এঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আজও 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে এঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

॥ কান্না ॥

নতুন বৌ কাঁদছে।

খবরটা শ্বশুরের কানে যেতেই তিনি ছুটে এলেন।

বিস্মিত হয়ে বৌমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে মা? কাঁদছ কেন?

নতুন বৌ জবাব দিলো না—মুখ নীচু করে রইল।

—কি মা? চুপ করে রইলে যে?



বৌমা চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, বাবা, দেওয়ানজী কৃত্তিবাসকে বাড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—তাড়িয়ে দিয়েছেন? কিন্তু কেন?

—সে এখন বুড়ো হয়েছে। আগের মত কাজ-কর্ম করতে পারে না তাই।

একটু পরে নতুন বৌ আবার বললে—বলুন তো বাবা, এই

বয়সে এখন সে কোথায় যাবে? কি করে চলবে ওর সংসার? ওর ছেলে মেয়ের কি দশা হবে?

শ্বশুর রামজীবন দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠালেন।

দয়ানন্দ সামনে এসে দাঁড়াতেই রামজীবন জিজ্ঞাসা করলেন, বৌমা যা বল্‌ছে তা কি সত্য?

দয়ানন্দ মাথা নীচু করে জবাব দিলে, হ্যাঁ। কৃত্তিবাস আজকাল কাজ-কর্মে বড্ড বেশী ভুল করছে। তাই ওকে আমি জবাব দিয়েছি।

রামজীবন গম্ভীর হয়ে বললেন, কাজটা ভাল করনি দয়ানন্দ। এই বুড়ো বয়সে ও কি করে সংসার চালাবে?

কৃত্তিবাসের কথা উঠ্‌তেই রামজীবনের চোখের সামনে ভেসে উঠল অতীতের স্মৃতি।

এখন কৃত্তিবাস বুড়ো হয়েছে—শক্তি কমে গেছে। কিন্তু একদিন সে ছিল মস্ত জোয়ান। এক নিঃশ্বাসে কত কাজ করত। এ বাড়ীর কতজনকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। আজ তারা বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে।

আর আজ কৃত্তিবাস?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রামজীবন দয়ানন্দকে বললেন, তুমি এক্ষুণি কৃত্তিবাসকে এ বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাকে গিয়ে বল, নতুন বৌ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

দয়ানন্দ চলে যাবার পর রামজীবন বৌমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কেঁদোনা বৌমা। কৃত্তিবাস আজ থেকে এই বাড়ীতেই থাকবে।

খবরটা কৃত্তিবাসের কানে যেতেই সে আনন্দে ছুটে এল নতুন বৌ রাণী ভবানীর কাছে।

রাণী ভবানার সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে দু'হাত তুলে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে বললে, মা আমার! তোমার করুণা আমার মত হাজার হাজার দুঃখীর বেদনাকে দূর করে দিক।

বৃদ্ধ কৃত্তিবাসের এই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি।

সত্যি সত্যিই রাণী ভবানী কৃত্তিবাসের মতো হাজার হাজার দীন-দুঃখীর বেদনাকে দূর করতে পেরেছিলেন। তাইতো আজো বাংলার হাজার হাজার লোকের মুখে রাণী ভবানীর নাম শুনতে পাওয়া যায়।

———

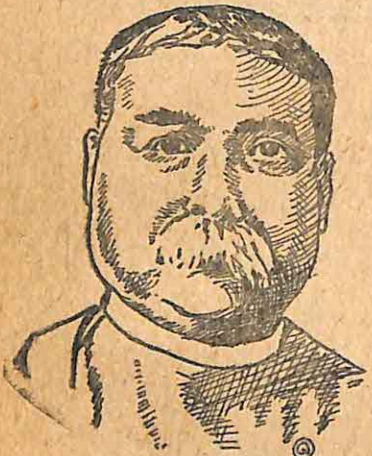
॥ দূরের যাত্রী ॥

গাড়ী ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে হুশ্ হুশ্ শব্দে।

একটা কামরায় দু'জন যাত্রী। দু'জনেই দূরের যাত্রী।

যাত্রীদের ভেতরে একজন বাঙ্গালী আর একজন ইংরেজ।

ইংরেজরা সাধারণতঃ ভারতীয়দের নেটিভ বলে ঘৃণা করত। তাই সাহেব বাঙ্গালী ভদ্রলোককে পথের সাথী পেয়ে খুশী হতে পারেন নি। সাহেব অস্বস্তি বোধ করছিলেন মনে মনে।



কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। শুধু মাঝে মাঝে কট মট করে তাকাচ্ছিলেন ভদ্রলোকের দিকে।

বাঙালী ভদ্রলোকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। গাড়ীর দোলানিতে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠলেন। দেখলেন তাঁর পায়ের জুতো জোড়া কামরায় নেই।

ভদ্রলোক বেশ বুঝতে পারলেন যে এ কাজটা ঐ সাহেব ছাড়া আর কেউ করেনি। বিপদে ফেলার জন্য তাঁর জুতো জোড়া জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তিনি ভীত হলেন না—মনে মনে হাসলেন।

চোখ তুলে দেখলেন তাঁর সহযাত্রী ইংরেজ ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন।

সাহেব ঘুমুচ্ছেন আর তাঁর কোটটা রয়েছে ঠিক মাথার কাছে।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সাহেবের কোটটা নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

কোটটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর সাহেবের ঘুম ভাঙ্গল।

সাহেব চমকে উঠলেন।

একি! তার কোটটা কোথায়?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাহেব বাঙ্গালী ভদ্রলোককে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোটটা কোথায় জানো?

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, তোমার কোট আমার জুতোকে খুঁজতে গিয়েছে।

সাহেব এই ধরণের উত্তর প্রত্যাশা করেন নি।

নেটিভদের ভেতরেও যে তেজস্বী লোক আছে তা সাহেব বুঝতে পারলেন।

এই তেজস্বী ভদ্রলোকের নাম—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এঁর তেজস্বীতা ও নির্ভীকতা সত্যই অতুলনীয়। তাইতো বাঙ্গালারা এঁর নাম উচ্চারণে আজো গর্ব বোধ করে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতার নাম ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

।। তেঁতুল পাতার ঝোল ।।

গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে সে বাস করতো।

খুবই কষ্টে তার সংসার চলত। কোনদিন জুটতো কোনদিন জুটতো না। সেদিন সে তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে কাটাত।

এতো অভাবেও তার মনে দুঃখ ছিলো না। বেশ আনন্দেই দিন কাটাত।



শোনা যায় তার মত পণ্ডিতলোক নাকি সে সময় সারা বাংলাদেশে আর ছিলো না।

লোকাটার পাণ্ডিত্যের কথা রাজার কানে গেল।

রাজা ডেকে পাঠালেন। কিন্তু লোকটা দেখা করতে এলো না। বলে পাঠালো আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট, অর্থের বাসনা আমার নেই।

রাজা শুনে বিস্মিত হলেন।

শেষে একদিন রাজা নিজেই রওনা হলেন তার বাড়ী। খুঁজতে খুঁজতে কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দেখলেন একটা বড় তেঁতুল গাছের নীচে বসে লোকটা অনেকগুলো ছাত্রকে পড়াচ্ছে।

লোকটার সঙ্গে রাজার আলাপ হল।

কথাবার্তার পর রাজা জিজ্ঞেস করলেন, সাংসারিক অভাবের কথা। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

লোকটা বলল, অভাব আছে কিনা তা আমি জানি না, আমার বৌ জানে। তবে আমার মনে হয় না যে আমার কোনও অভাব আছে।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল তার স্ত্রী।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মা স্পষ্ট করে বলত তোমাদের সংসারে অভাব আছে কিনা। আমি তা'হলে তা সাধ্যমত দূর করার চেষ্টা করব।

—না মহারাজ, আমাদের সংসারে কোনও অভাব নেই। ঘরে শোবার জন্য আছে মাদুর, ভাত খাবার জন্য আছে পাথর, রাঁধবার জন্য আছে মাটির হাঁড়ি, আর আছে তেঁতুল গাছের পাতা। আমার স্বামী তেঁতুল পাতার ঝোল খেতে খুব ভালবাসেন।

মহারাজ শুনে অবাক হলেন।

বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তেঁতুল পাতার ঝোলেই সন্তুষ্ট জেনে রাজা মাথা হেঁট করলেন। শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে ভাবলেন এমন নির্লোভ মানুষকে তিনি সাহায্য করবেন!

বল'ত এই নির্লোভ পণ্ডিতটি কে?

—ইনি হলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রমানাথ। নিরালায় গ্রামে বাস করতেন বলে অনেকে তাঁকে 'বুনো রমানাথ' বলত।

।। মাতৃ পূজা ।।

সন্ধ্যাবেলা কালীবাড়ীর উঠানে বসে এক যুবক গান গাইছিল. গাইছিল শ্যামাসংগীত। বন্ধুদের নিয়ে অশ্বিনী দত্ত যাচ্ছিলেন ঐ পথ দিয়ে। তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছাল গানের সুর।

থমকে দাঁড়ালেন।

বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেন, কে গাইছে এমন সুন্দর গান? ভারী মিষ্টি লাগ্‌ছে শুনতে!

অশ্বিনী দত্ত যুবকের সামনে এসে দাঁড়াতেই যুবক প্রণাম করলো।

যুবকের গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি? কোথায় থাক?

নাম ধাম আর পরিচয় জেনে অশ্বিনী দত্ত খুশী হলেন।

খুশী হয়ে বললেন, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর আমার বাসায় যেও। দত্ত বাবু একদিন যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জাতীয় সংগীত গাইতে জান?

—হ্যাঁ জানি।

—গাও তো।

যুবক জাতীয় সংগীত গাইল। শুনে খুশী হলেন দত্ত মশাই। খুশী হয়ে বললেন, তোমাকে আমাদের দলে নিতে চাই। তোমাকে দেখে বেশ কাজের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। শুনে যুবক নিজেকে ধন্য বলে মনে করলো।

সেদিন থেকে যুবক রোজই দত্ত বাড়ীতে আসত। সন্ধ্যের

বৈঠকে গান গেয়ে শোনাতো। শুনে সবাই আনন্দ পেতো, মুগ্ধ হতো।

গান শুনতে শুনতে একদিন দত্ত বাবু যুবককে বললেন, তুই হবি আমাদের চারণ। দেশের লোককে তুই মাতিয়ে তুলবি স্বদেশী গান গেয়ে।

অশ্বিনী দত্তের এ আশীর্ব্বাদ মিথ্যে হয়নি।

তাইতো তিনি জীবিত কালেই দেখে যেতে পেরেছেন যুবককে চারণ কবি ও স্বদেশী যাত্রাওয়ালা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে।

উৎসাহ পেয়ে যুবক শেষে গড়ে তুললো যাত্রা-গানের দল।

স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে সাধারণের বোঝবার মতো করে সে একটা নাটক লিখে ফেললো। তারপর সে তার দল নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

যুবক যে পালাগান লিখেছিলো তার নাম—'মাতৃপূজা'।

দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা, বিদেশী বণিকদের শোষণের কাহিনী ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা এই পালায় সুন্দর ও সহজ করে ব্যক্ত করা হয়েছিল।

যুবকের নাম আস্তে আস্তে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল।

তার পালা শোনার জন্য হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান দূর দূর থেকে ছুটে আসত যাত্রার আসরে, লোক গিজ গিজ করত—

শেষ পর্যন্ত না শুনে কেউই আসর ছেড়ে উঠতে চাইতো না।

ইংরাজ সরকারের সহ্য হোল না এতটা বাড়াবাড়ি। তাই মাতৃ-পূজা পালা থেকে খুঁজে বের করলো—'রাজদ্রোহাত্মক উক্তি।'

যুবকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল।

বিচারে যুবকের আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল আর "মাতৃপূজা" পালা বাজেয়াপ্ত করা হল।

বলতে পার কে এই যুবক, এই চারণ কবি ?

—ইনি হলেন বরিশালের বিখ্যাত মুকুন্দ দাস।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় ধানরি গ্রামে ১২৮৫ সালে এঁর জন্ম হয়। এঁর আসল নাম যজ্ঞেশ্বর দে হলেও ইনি জনসাধারণের কাছে "চারণ কবি মুকুন্দ দাস" নামেই পরিচিত।

॥ নতুনের সন্ধানে ॥

ইংরেজী উনিশ'শো একুশ সালের কথা।

ভদ্রলোক গিয়েছেন লারাকানা জেলায় বেড়াতে। সঙ্গে আছে কয়েকজন বন্ধু। বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় হঠাৎ বড় ভাঙ্গা বাড়ী দেখতে পেলেন। বাড়ীর চারদিকে জঙ্গল।

বন্ধুদের নিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন। দেখলেন ভাঙ্গা বাড়ীর এক পাশে অনেকগুলো মাটির জালা রয়েছে।

ভদ্রলোক একটা জালার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের একটা আঙ্গুল কেটে গেল।

বন্ধুরা বললে, নিশ্চয়ই ওর ভেতরে সাপ আছে। তোমাকে সাপে কামড়েছে।



সাপ মারার জন্য মাটির জালা ভেঙ্গে ফেলা হল।

কিন্তু সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না। সাপের বদলে বেরিয়ে এল ছোট ছোট দশটা মাটির ভাঁড়। একটা ভাঁড়ের মুখে একখানা পাথরের ছুরি পাওয়া গেল। ঐ ছুরিতেই যে ভদ্রলোকের হাতের আঙ্গুল কেটে গেছে তা বুঝতে পারলেন।

দেখতে দেখতে জালার ভেতর থেকে বের হল আরো কতো কি।

এলেন রহস্যপুরীর রত্নদ্বারে।

দেখা গেল প্রত্যেকটা মাটির ভাঁড়ের ভেতরে রয়েছে মানুষের দেহের এক একখানা হাড়—আর রয়েছে ধান, যব, গুড়, তামাক, কাঁচের গহনা, বাসন-পত্তর ও পুঁতির মালা....।

দেখা গেল নানা রকমের পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রও সাজান রয়েছে স্তরে স্তরে।

ভদ্রলোক ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে প্রত্নতত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শালকে বললেন সব খুলে,—জানালেন তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী।

মার্শাল শুনে বিস্মিত হলেন।

প্রচুর অর্থ মঞ্জুর হল। মার্শালের আদেশে ভদ্রলোক আবার রওনা হলেন ঐ জায়গায়। রওনা হলেন লোকজন নিয়ে স্তূপ খোঁড়ার জন্য।

উনিশ'শো বাইশের শীতকাল।

স্তূপ খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। তাঁবু পড়েছে—বন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে,—বসান হয়েছে নলকূপ। পুরোদমে কাজ চলছে।

মাটি খুঁড়ে এবারেও অনেক জিনিষ পাওয়া গেল।

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বের হলো হাতীর দাঁতের কাজ করা শাঁখের গহনা-পত্তর, কাঁচের পাত্র, বালা আর পাথরের থালা বাটি গ্লাস। বের হলো তামার ও মাটির শীলমোহর, নানা জীবজন্তুর মূর্তি, ঘর-বাড়ী ও দালান ইত্যাদি। এই সব নিদর্শন ও ছবি নিয়ে ভদ্রলোক রওনা হলেন সিমলায়।

জন মার্শাল তখন সিমলায় বাস করছিলেন।

মার্শালকে তিনি দেখালেন নিদর্শন ও ছবিগুলো। বিভিন্ন জিনিষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও শোনালেন সহজ ও সরল ভাবে। আস্তে আস্তে সাহেব সব বুঝলেন। বুঝলেন একটি প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হল। এই হল মহেন্‌জোদারো আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মহেনজোদারো আবিষ্কৃত হলেও যিনি এটা আবিষ্কার করলেন তাঁর নাম বাইরে প্রকাশ করা হল না। এমন কি যাতে প্রকাশ না হতে পারে সে জন্য মার্শাল কায়দা করে ভদ্রলোককে বাংলায় বদলী করে দিলেন। কিন্তু মার্শালের এ কৌশল ব্যর্থ হল।

আস্তে আস্তে প্রকাশিত হয়ে গেল ভদ্রলোকের নাম—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ থেকে প্রায় ৭৮ বৎসর আগে—১২৯২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতের ইতিহাসে মহেন্‌জোদারো এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

॥ কুলি ব্যারিস্টার ॥

ইংরেজী উনিশ'শো তের সালের কথা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ভারতীয়দের উপরে ভীষণ অত্যাচার চলছে। অত্যাচার করছে—ইংরেজরা।

ঠিক এমনি সময় একজন ভারতীয় ব্যারিস্টার কোনো একটা মামলার কাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হলেন।

ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা।



রাস্তাও কম নয়। প্রায় মাস দেড়েক জাহাজে কাটিয়ে ব্যারিস্টার দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল রাজ্যে এসে নামলেন।

পাশেই ট্রান্সভ্যাল রাজ্য।

ব্যারিস্টারকে মামলার কাজে ট্রান্সভ্যালে যেতে হবে। তাই তিনি একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলেন।

পথে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

গাড়ী কয়েকটা ষ্টেশন যাওয়ার পর একজন সাহেব এসে তাঁকে ভালভাবে দেখলেন। দেখলেন লোকটা ভারতীয়।

ভারতীয়রা তখন ইংরেজের কাছে কালা আদমি, নেটিভ, কুলি।

গাড়ী ষ্টেশনে থামা মাত্র সাহেব গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে রেল কোম্পানীর কয়েকজন লোককে নিয়ে এসে কামরার সামনে

দাঁড়িয়ে অভদ্র ভাবে ব্যারিস্টারকে গাড়ী থেকে নেমে আসতে বললেন।

ব্যারিস্টার প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। আমি কেন গাড়ী থেকে নামব ?

সাহেব বললেন, হোকগে। তবুও তোমাকে গাড়ী থেকে নেমে আসতে হবে। কারণ কালা আদমিদের প্রথম শ্রেণীতে যেতে দেওয়া হয় না।

ব্যারিস্টার বললেন, তাহলে আমাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে কেন ?

সাহেব বললেন, যদি তুমি এমনি নামতে রাজী না হও তাহলে সেপাই দিয়ে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হবে।

শুনে ব্যারিস্টার বিস্মিত হলেন।

বিস্মিত হয়ে বললেন, বেশ, তাই কর। আমি কখনোই গাড়ী থেকে নামব না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেপাই কামরার সামনে এসে দাঁড়ায়।

তারপর ?

তারপর তারা ভেতরে ঢুকে ব্যারিস্টারকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ীর কামরা থেকে নামিয়ে দিলে। জিনিষ-পত্তর প্ল্যাটফরমের উপরে ছড়ানো অবস্থায় পড়ে রইল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

ব্যারিষ্টার দারুণ শীতে প্ল্যাটফরমের উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষে পরের ট্রেনে কোনও রকমে যাওয়ার ব্যবস্থা হল।

এর পর কিছুটা পথ ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে যেতে হয়। তাই তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে চাপতে গেলেন।

টিকিট করাই ছিল। তবুও গাড়ীর কণ্ডাক্টর বললো, এ টিকিট চলবে না। ব্যারিষ্টার জানতেন যে এ টিকিটে পরের দিন পর্যন্ত যাওয়া চলে। তিনি কণ্ডাক্টরের মতলব বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন যে, কালা আদমি সাহেবদের গাড়ীতে চাপে এটা তাদের অসহ্য। তবুও তিনি নরম স্বরে বললেন, কোনও রকমে আমাকে একটু জায়গা করে দাও। জরুরী কাজ আছে যেতেই হবে। এ কথা শুনে কণ্ডাক্টর বলল, কুলি, তুমি যদি কোচম্যানের পাশে বসে যেতে রাজী হও তাহলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

ব্যারিষ্টার অন্য উপায় না দেখে রাজী হলেন।

গাড়ী চলতে লাগল।

হঠাৎ কণ্ডাক্টরের সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। তাই সে চট্ করে বাইরে এসে গাড়ীর পাদানির উপরে একটা নোংরা চট বিছিয়ে দিয়ে ব্যারিষ্টারকে বললো, এই কুলি, তুমি এখানে এসে বসো, আমি কোচম্যানের পাশে বসে সিগারেট খাবো।

ব্যারিষ্টার আর সহ্য করতে পারলেন না। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টর তাঁকে মারতে শুরু করল। তাঁকে মারতে মারতে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু ব্যারিষ্টার নামতে চাইলেন না,—গাড়ীর ডাণ্ডা ধরে ঝুলতে লাগলেন।

গাড়ীর ভেতরে কয়েকজন সাহেব যাত্রী ছিলেন।

তাঁরা কণ্ডাক্টরের ব্যবহারে দুঃখিত হলেন। শেষে তাঁরা তাকে বকতে শুরু করলেন।

তখন কণ্ডাক্টার বাধ্য হয়ে ব্যারিস্টারকে কোচম্যানের পাশে বসতে দিয়ে নিজে ভিতরে গিয়ে বসল।

যে ভারতীয় ব্যারিস্টার সেদিন ঐভাবে অপমানিত হয়েছিল তিনি কে জানো? ইনি হলেন গান্ধীজী।

ইংরেজদের এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নিতে পেরেছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়,—বহু বছরের আন্দোলনের ফলে ইংরেজরা বাধ্য হয়েছিল তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে।

তিনি যে অন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার নাম—সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলেই ইংরেজ শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে ভরতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে—আমরা স্বাধীন হয়েছি। পরাধীন ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা, ফিরে পেয়েছে তার সম্মান। এটা কি কম গৌরবের কথা।

তাইতো ভারতবাসী আজও ভুলতে পারেনি গান্ধীজীকে, তাইতো ভারতবাসী আজো তাঁর নাম স্মরণ করে, তাঁকে শ্রদ্ধা আর ভক্তি জানায়।

গান্ধীজীর পুরো নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

ইংরেজী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজীর জন্ম হয়। গান্ধীজীর বাবার নাম করমচাঁদ গান্ধী আর মায়ের নাম পুতলী বাঈ।

———

।। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ।।

দেশ তখন পরাধীন। আমরা তখন ব্রিটিশের কড়া শাসনের শৃংখলে শৃংখলিত। স্বাধীন চিন্তা নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষিদ্ধ হলেও বন্ধ থাকেনি আমাদের সংগ্রাম। বেয়নেট, গুলি আর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সরকার বন্ধ করতে পারেনি আমাদের সংগ্রামকে।



বিপ্লবের যে আগুন সেদিন জ্বলেছিল মানুষের মনে আর প্রাণে, তারই লেলিহান শিখা গ্রাম থেকে গ্রামে, এক দেশ থেকে আর এক দেশ ছড়িয়ে পড়তেও বেশী সময় নেয়নি। সরকার তাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে লাঞ্ছনা, নির্যাতন আর মৃত্যু-দণ্ডের ভয় দেখিয়ে বানচাল করে দিতে চেয়েছিল মানুষের ন্যায় দাবীকে। দিকে দিকে সেদিন তাই নেমে এসেছিল মৃত্যুর যবনিকা।

ঠিক এমনি দিনে পিতৃ-মাতৃহীন এক তরুণ কিশোর নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছিলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে পরাধীন ভারত মায়ের ললাটে রক্তের তিলক পরাতে। আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় সে নষ্ট করেনি সময়, বীরের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিলো মৃত্যুর মুখোমুখি। পিছনে ফিরে তাকাবার মতো স্বভাব তার ছিলো না। সংগ্রামকে সার্থক করে তোলার জন্যে সে জাগিয়ে তুলেছিলো তারই মতো—শত শত তরুণ কিশোরকে। আঠারো বছর বয়সের তরুণ কিশোরের স্মৃতি তাই আজও আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কিশোরের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব ছবি। মজঃফরপুর জেলার বিচারালয়ের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে কিশোরকে বলতে শুনি, "এখানে সকলের সামনে আমার কিছু বলার আছে।"

বিচারক বাধা দিয়ে বলেন, 'এখন আর সে সময় নেই।'

সময় না থাকলেও, তাকে বলার সুযোগ না দিলেও কিশোর উদাত্ত কণ্ঠে বলে, আমাকে যদি অনুমতি দেন তাহলে যাবার আগে আমি আমার দেশের তরুণদের জানিয়ে যেতে চাই যে কি করে বোমা তৈরী করতে হয়।"

কিশোরের কথা শুনে বিচারক মৃদু হাসলেন। মৃদু হেসে রায় দিলেন—কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় কিশোরের ফাঁসির হুকুম হল।

ইংরেজী উনিশ'শো আট সালের এগারই আগষ্ট।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ দিনটি স্মরণীয়।

অন্যান্য দিনের চেয়ে কিশোর সেদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে দেহকে শুদ্ধ করে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কারাগার কক্ষের দরজায় আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

সময় মতো মৃত্যুদূত সামনে এসে দাঁড়ালো।

দরজা খুলে গেল। কারা প্রহরীরা কিশোরের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললো আর হাত দুটে পেছনে করে শৃংখলিত করে নিয়ে চললো—বধ্যভূমির দিকে।

ধীর পদক্ষেপে কিশোর চলল এগিয়ে। তার গতি মন্থর হলেও তাতে ছিল না ভীরুতার ছাপ।

জল্লাদ এলো ফাঁসির দড়ি নিয়ে।

কিশোর নিজের হাতে সেই দড়ি নিজের গলায় পরিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ, ভাই! তোমরা ফাঁসির দড়িতে মোম মাখাও কেন?

মৃত্যুপথ যাত্রী কিশোরের মুখে এই প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিশোরের এই প্রশ্নে সেদিন তাদের প্রাণ কেঁদেছিল কিনা তা ইতিহাসে লেখা নেই। ইতিহাসে শুধু লেখা আছে—ধীরে ধীরে কিশোর এগিয়ে এসে নির্ভয়ে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো। কিশোরের মুখ থেকে তখনও হাসির রেখা মিলিয়ে যায়নি। শেষবারের মতো কিশোর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—"বন্দে মাতরম!"

তারপর? তারপরের ইতিহাস আরো করুণ। মুহূর্তে নিভে গেল আঠারো বছর বয়সের এক তরুণ কিশোরের উজ্জ্বল জীবন-প্রদীপ।

শুধু ভারতবর্ষ নয়—পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশও কোন দিন ভুলতে পারবে না এই তরুণ কিশোরকে।

কে এই তরুণ কিশোর?

—কিশোরের নাম ক্ষুদিরাম। ইংরেজী আঠারশো উননব্বই সালের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রামে ক্ষুদিরামের জন্ম হয়। তার অপূর্ব দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান আমাদের মনে শুধু বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না—প্রথম শহীদ হিসাবে শ্রদ্ধা জানাতেও বাধ্য করায়।

॥ একটি মহৎ মৃত্যু ॥

মেজর এনিস ইংরেজের হয়ে অনেক ওকালতি করলেন, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে অনেক বোঝালেন। বললেন, এতে আপনার তেমন কোন ক্ষতি হবে না। কোম্পানী আপনার ভালর জন্যেই এই প্রস্তাব করেছে।

রাণী বললেন, মেজর সাহেব, আপনি দেখছি অদ্ভুত কথা বলছেন। কোম্পানী আমার রাজ্য খাস করে নিচ্ছে, আর আপনি বলছেন, আমার তেমন কোন ক্ষতি হচ্ছে না। মেজর এনিস মৃদু হেসে বললেন, কোম্পানী এ জন্যে আপনাকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে রাজী হয়েছে।

—আমার রাজ্য ?

—রাজ্য থাকবে কোম্পনীর দখলে।



—শাসন কর্তৃত্ব ?

—শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানীর। রাণী সহ্য করতে পারলেন না। উদ্ধত কণ্ঠে বললেন, চুপ করুন মেজর সাহেব। ইংরেজের হয়ে আপনি অনেক ওকালতি করেছেন। আপনার কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

—আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখুন।

—খুব বুঝেছি। আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। আমি কোম্পানীর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলুম।

মেজর এনিস গম্ভীর হয়ে বললেন, আর একবার ভেবে দেখুন। কাজটা কিন্তু ভালো করছেন না।

—আপনি ফিরে যান এনিস সাহেব। ফিরে গিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের বলুন যে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ কারও কর্তৃত্ব মানতে রাজী নয়। সে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য চালাবে। ঝাঁসীর উপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব করবার কোনই অধিকার নেই। রাজা গঙ্গাধর মারা গেলেও, রাণী লক্ষ্মাবাঈ এখনও জীবিত আছে।

রাণী শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কর্তৃত্ব মানতে রাজী হলেন না।

ইংরেজরাও রাণীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করল।

ইংরেজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাণী বিদ্রোহিনী হলেন। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজের সেনাপতি ইউরোজ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝে ঝাঁসী অবরোধ করলেন।

লক্ষ্মীবাঈ কি আর করেন। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু নানা সাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থিনী হয়ে দূত পাঠালেন।

পেশওয়া নানা সাহেব রাণীর বাল্যবন্ধু। রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের হাতে বিপন্না শুনে তিনি তাঁর বিচক্ষণ সেনাপতি তাঁতিয়া টোপেকে ডেকে পাঠালেন। পেশওয়া বললেন, টোপে, তুমি তৈরী হও। ঝাঁসার রাণী আজ বড়ই বিপন্না হয়ে আমার সাহায্য প্রার্থিনী। তাঁকে এই বিপদের দিনে সাহায্য করতেই হবে। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, বন্ধু, তোমাকে আজই রওনা হতে

হবে। সৈন্য নিয়ে তুমি ঝাঁসার দিকে রওনা হও, দেরী কোর না।

নানা সাহেবের আদেশে অসংখ্য সৈন্য ঝাঁসীর দিকে রওনা হল। তাঁতিয়া বেতেয়া নদীর তীরে শিবির তৈরী করলেন।

ইংরেজ সেনাপতি ইউরোজ যখন দেখলেন অসংখ্য সৈন্য ঝাঁসীর দিকে এগিয়ে আসছে তিনি অদ্ভুত সতর্কতা অবলম্বন করে নতুন ভাবে সৈন্য সাজালেন।

এদিকে রাণী খবর পেলেন, নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া টোপে তাঁকে সাহায্যের জন্য সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীর দিকে এগিয়ে আসছেন।

রাণী আনন্দে ঘনঘন তোপ দাগতে শুরু করলেন। তোপ দেগে তাঁতিয়া ও তাঁর সৈন্যদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন আর নিজেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো।

কিন্তু ইংরেজের আক্রমণ টোপের সৈন্যেরা সহ্য করতে পারলো না, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করলো। সৈন্যেরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে পগেলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগল। বাধ্য হয়ে তাঁতিয়াকে পিছু হটতে হল।

রাণী লক্ষীবাঈ রাজ্য রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেলেন।

ইংরেজরা জয়ী হলো—ঝাঁসী অধিকার করে নিল।

* * * *

ইংরেজরা ঝাঁসা অধিকার করে নিলেও নানা সাহেব আর

তাঁর সেনাপতি তাঁতিয়াকে দমন করতে পারলো না। তাঁরা দু'জনেই স্বতন্ত্রভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে চললেন।

তাঁতিয়া একদল সৈন্য নিয়ে রওনা হ'লেন জয়পুরের দিকে।

জয়পুর তখন কোম্পানীর শাসনে বিক্ষুব্ধ। তাঁতিয়া ভাবলেন, জয়পুরের বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই তাঁকে স্বাগত জানাবে—তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলবে। কিন্তু তাঁতিয়ার সে আশা পূর্ণ হলো না।

তাঁতিয়া মহামুশকিলে পড়লেন। ইংরেজরা তাঁতিয়াকে ধরার জন্য চারদিকে চর পাঠালো। চরেরা তাঁতিয়ার সন্ধান করে বেড়াতে লাগলো।

খবরটা তাঁতিয়ার কানে গেল।

তাঁতিয়া হুঁসিয়ার হয়ে গেলেন। শেষে সৈন্যদের বিদায় দিয়ে পারনের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। এই বনে একদিন তাঁর এক পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বন্ধু মানসিংহ তাঁতিয়াকে একাকী ঘুরে বেড়াতে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে? আপনার সৈন্যদল কোথায়?

তাঁতিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন, বন্ধু, সবই আমার অদৃষ্ট। ভারতের যে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর সফল হল না। আজ আমি বিপন্ন—চোরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

মানসিংহ ক্রুর হাসি হেসে বললেন, বন্ধু, কোন ভয় নেই। আপনি এই অরণ্যে বিশ্রাম করুন। নিশ্চিন্তে থাকুন—সৈন্য সংগ্রহ করে সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন।

তাঁতিয়া মৃদু হেসে বললেন, তা আর সম্ভব নয়।

মানসিংহ বললেন, কেন ?

তাঁতিয়া বললেন, সে অনেক কথা। পরে বলব।

একটু থেমে তাঁতিয়া বললেন, বন্ধু, আমি এখন আপনার আশ্রয়ে কিছুদিন থাকতে চাই। আমাকে একটু আশ্রয় দেবেন ? ইংরেজ আমার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, কদিন যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব জানি না।

মানসিংহ হাসতে হাসতে বললেন, নিশ্চয়। আপনি আমার আশ্রয়ে থাকলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

মানসিংহ এই কথা বলে তাঁতিয়াকে আশ্রয় দিলেন, কিন্তু গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। তাঁতিয়া বিশ্বাস করে মানসিংহকে অনেক গোপন কথা বলেছিলেন। মানসিংহ তা ইংরেজের কানে তুলে দিয়ে, তাঁতিয়াকে ধরিয়ে দিয়ে অদ্ভুত আনন্দ পেলেন। মনে করলেন একটা মস্ত বড় কাজ করলেন।

সেদিনটা ছিল ইংরাজী আঠারশো উনষাট সালের সাতই এপ্রিল।

গভীর রাত। পারনের গভীর অরণ্যে নিজের শিবিরে তাঁতিয়া বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ ইংরেজ সেনাপতি মাডের সৈন্য তাঁর শিবিরের সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁতিয়া নিরুপায় হয়ে বন্দী হলেন।

পরদিন সকালে সৈন্যেরা তাঁতিয়াকে বন্দী করে মাডের শিবিরে নিয়ে এলো।

বিচার শুরু হলো

বিচারে বিচারকরা তাঁতিয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। বিচারের শেষে সেনাপতি মাড সাহেব তাঁতিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু বলার আছে ?

তাঁতিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন, মাড সাহেব, আমি আমার কর্তব্য করেছি—দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছি। আমি বীরের মতো যুদ্ধ করেছি, কাপুরুষের মতো স্ত্রী আর শিশুর রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত করিনি। কাউকে ফাঁসির হুকুম দিইনি বা অযথা নির্যাতন করিনি। আমি শুধু এই কথাই জানিয়ে যেতে চাই।

মৃত্যুপথযাত্রী একজন সেনাপতির কাছ থেকে এমন জবাব এর আগে আর কেউ শুনতে পেয়েছে কি ? না, পায়নি। তাইতো আমরা আজও তাঁকে ভুলতে পারিনি—কোন দিন পারব বলে মনেও হয় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ হিসাবে তাঁতিয়া টোপে চিরদিনই আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হ'য়ে থাকবেন।
